এই লেখাটি 'মনভুবন' এর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশুর বিকাশ ঃ পরিবেশের ভূমিকা (২)

শিশুর বিকাশঃ পরিবেশের ভূমিকা (১) এতে আমরা একটি শিশু পরিবার কিভাবে বড় হচ্ছে বা বেড়ে উঠছে তা আমরা আলোচনা করেছি। শিশুর বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে যেমন ঘরের পরিবেশ একটা বড় ভূমিকা পালন করে তেমনি বাইরের তথা সামাজিক পরিবেশ ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা শিশুর বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রাখে/ ফেলে।

এক্ষেত্রে আমরা দেখব সামাজিক পরিবেশ কিভাবে শিশুর বিকাশ প্রভাব ফেলে।

শিশুর বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে তার পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যকার সম্পর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যরা তাদের আত্মীয় স্বজনদের ও পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে কি পরিমাণে যোগাযোগ করেন এবং আত্মীয়রা ও প্রতিবেশীরা তাদের সঙ্গে কি পরিমাণ যোগাযোগ করে সম্পর্ক রক্ষা করেন। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাচ্চাটিরও আত্মীয়দের এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয় যা তার সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে (আনচিনো ও তার সহযোগীরা, ১৯৯৬)। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে কম যোগাযোগ রাখেন তারা কোন সমস্যায় পড়লে কম সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকেন তাদের পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের কাছ থেকে (গারমেজী ও মাস্তেন, ১৯৯৪)। এছাড়াও দেখা গেছে যে, যেসব পরিবারের সদস্যদের কম সংখ্যক বন্ধু রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে কম যোগাযোগ রক্ষা করে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমস্যাযুক্ত আচরণ/যোগাযোগের ধরণ রয়েছে (গারমেজী ও মাস্তেন, ১৯৯৪)।

> **শিশুর বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে তার পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যকার সম্পর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে**

যেসব পরিবার সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত থাকে (যেমন-কম বেতনের চাকুরী করা, দূষিত পরিবেশে বসবাস করা, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করা ইত্যাদি) সেসব পরিবারের সদস্যরা নানারকম সমস্যার মধ্যে থাকে (গুড়িয়ার, ১৯৯৭)। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এসব পরিবার যেহেতু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় থাকে এদের মধ্যে প্রায় ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে যা ঐ পরিবারের বাচ্চাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে (গুড়িয়ার, ১৯৯৩)। এর পাশাপাশি এসব পরিবারের সদস্যরা যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধার সুম্মখীন হয়ে থাকে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বাচ্চাদের উপর পরে থাকে।

> **সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিতরা নানারকম সমস্যার মধ্যে থাকে**

কম সুবিধাভোগী পরিবারের অভিভাবক বা পিতামাতারা যেসব স্থানে/ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে (যেমন-কলকারখানায়, কম আলো-বাতাস পূর্ণ স্থানে কাজ করা, বাসায় কাজ করা, ছোট জায়গায় বেশি মানুষ কাজ করা, গার্মেন্টসে কাজ করা, কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহযোগী না পাওয়া, দূষিত পরিবেশে কাজ করা ইত্যাদি)। এসব বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবারের বড় সদস্যদের উপর প্রভাব ও চাপ পড়ে থাকে এবং এগুলির নেতিবাচক প্রভাব ও বাচ্চাদের উপরেও পরে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এসব সমস্যার জন্যও তারা (বাবা-মায়েরা) বিরক্ত বা রাগ করে থাকেন বা বিষন্ন থাকেন যা অনেকক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের প্রাথমিক চাহিদাও (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) সঠিকমত প্রদান করতে পারেন না বা এই দায়িত্ব পালনও নিম্ন মানের হয়ে থাকে (ওয়ার, ১৯৯০)। সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের পিতা-মাতারা ও দেখা গেছে যে কম বেতনের চাকুরী করে থাকেন ফলে তারা সবসময় একটা চাপের মধ্যে থাকেন এবং এর সরাসরি প্রভাব তাদের বাচ্চাদের উপর পরে থাকে যার ফলস্বরূপ এদের মধ্যে নানারকম মানসিক সমস্যা দেখা যায় (রাটার, ১৯৯১)।

দারিদ্রতা তথা নিম্ন আর্থিক অবস্থার লোকদের বাচ্চারা অনেক সময় স্কুলে যেতে পারে না অথবা স্কুলে গেলেও নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না, ফলে তারা ঠিকমত পড়ালেখা বুঝতে ও শিখতে পারে না। আবার অনেক সময় স্কুলের বেতনও ঠিকমত দিতে পারে না ফলে পড়াশুনা ঠিকমত করতে পারে না, এতে করে সে পড়ালেখায় অনেক পিছিয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে নিজের প্রতি নেতিবাচক বিশ্বাস বা ধারণা জন্মায় (রাটার, ১৯৮৫, ১৯৯৫)। এছাড়া তারা স্কুলে অমনোযোগী ছাত্র/ছাত্রী অথবা পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রী হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং তারা তাদের শিক্ষকদেরও সহপাঠীদের সঙ্গে সমস্যাপূর্ণ আচরণ করে থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু কিছু বাবা মায়েরা তাদের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য অথবা তারা নিজেদের সাংসারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য সন্তানদের ঠিকমত খবর রাখতে পারেন না, এতে করে অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে বেশি মিশে থাকে। বিশেষ করে বয়ঃ সন্ধিকালের ছেলেরা। এরা বাবা-মায়েদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে। ফলে দেখা যায় যে, তারা ভাল বন্ধুর চেয়ে দুষ্ট বা খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত হয়। (যেমন-অন্যের জিনিস চুরি করা, মারামারি করা, ভাংচুর করা ইত্যাদি)। এ ধরনের কাজ তারা তাদের বন্ধুদেরকে দেখে শিখে বা অনুকরণ করে থাকে (কাজদীন, ১৯৯৫)।

গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া গেছে যে, যেসব এলাকায় খুব বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়, নাগরিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত (যেমন আলো-বাতাসহীন ঘিঞ্জি এলাকা; গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপ্রতুলতা, স্কুল-কলেজ নেই বললে চলে এমন সব কাজ কর্মের সুযোগ প্রভৃতি) এসব এলাকার বাচ্চার নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে (জারমেজী ও মাস্টেন, ১৯৯৪)।

এছাড়াও দেখা গেছে যে, যেসব বাবা মায়েরা চাকুরী করেন তাদের মধ্যে অনেকে তাদের বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রাখেন, ডে- কেয়ার সেন্টারে রাখেন এক্ষেত্রে তাদের বাচ্চাদেরকে যেহেতু দীর্ঘ সময় ঐখানে থাকতে হয় সেহেতু তাদের মধ্যে অস্থিরতা, রাগ বিরক্তি দেখা যায় (সিলভা ১৯৯৪)।

যেসব বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই হোস্টেলে থাকছে, এতিমখানায় থাকছে সেসব বাচ্চাদের অনেকের মধ্যে নানারকম আচরণগত ও মানসিক সমস্যা দেখা যায় (ম্যাকগার্ক, ১৯৯৩) এর কারণ হল ঐসব প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বাচ্চাদের মধ্যে মতপার্থক্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক পরিবেশও বাচ্চাদের তথা ছেলেমেয়েদের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে থাকে।

সাদিয়া শারমিন উর্মি (চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী), মনোবিজ্ঞানী, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।